1 JAN 2011
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

সংবাদ

সৃজনশীল পদ্ধতি

এমআর খায়রুল উমাম

পাঠ্যবই মনোযোগ দিয়ে পড়ে সে মোতাবেক সৃজনশীল বহুমুখী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে সঞ্চারণশীল করে তোলাই সৃজনশীল পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়। নতুন এ পদ্ধতি চালু করার আট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও শিক্ষার্থীরা এখনো পর্যন্ত তা আয়ত্ত করতে পারল না। শুধু শিক্ষার্থীদের কথা বলি কেন, শিক্ষকদের একটা বড় অংশ এ দলের মধ্যে রয়েছেন। সাধু উদ্যোগ বাস্তবায়ন জটিলতার কারণে আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরা সব সময় উদ্বিগ্ন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ নিরসনে এগিয়ে এসেছে ব্যবসা। কিছু শিক্ষক এবং গাইড বই নতুন পদ্ধতিকে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার করে নিয়েছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি ২০০৮ সালে চালু করে তা ২০১০ সালে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হলো। আমাদের শিক্ষকরা জীবনে যে পদ্ধতি দেখেনি তা তাদের দিয়ে বাস্তবায়ন করতে দেয়া হলো। এখানে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের অবস্থা কী হতে পারে তা অনুমান করা যায়। কিছু শিক্ষক ও গাইড ব্যবসায়ীরা নিজেদের মতো করে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করে দেয়ার সুযোগ ব্যর্থ হতে দিলো না। তারা কোমর বেঁধে মাঠে নেমে এলো। এদের প্রচলিত সৃজনশীল পদ্ধতি এখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দখল করে রেখেছে। সরকার এতে যে খুব অখুশি তা মনে হয় না। সরকারের আনন্দ সৃজনশীল পদ্ধতি দেশে চালু করতে সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষ যতই বলুক শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এখনো পারঙ্গম হয়ে উঠেনি। এতেই শতভাগ পাসের কাছাকাছি চলে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোচিং করতে শিক্ষার্থীরা ২৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ব্যবসাবান্ধব সরকার এমন ব্যবসা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত এ ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে না পারলে উন্নয়নের জোয়ার সাধারণ মানুষ দেখতে পাবে না। সৃজনশীল পদ্ধতি বর্তমান সময়ে এ ব্যবসার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রস্তুতিবিহীনভাবে নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার কারণে শ্রেণীকক্ষের চাইতে কোচিং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সমস্যা সমাধানে সন্তানের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ব্যবস্থাপত্র মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। তাই সারাদেশে এখন ২৬০০ কোটি টাকার কয়েকগুণ ব্যবসা চলছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি সফল করতে শিক্ষকদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষক বলে থাকেন যেতে একদিন, আসতে একদিন আর প্রশিক্ষণ একদিন। আমাদের দেশে প্রশিক্ষণগুলোর চেহারা সাধারণভাবে এমন। ধরে নেয়া যায় যদি শিক্ষকদের তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ খুব কঠোর নিয়মানুযায়ী হয়েছে তাহলেও কি বলা যাবে সৃজনশীল পদ্ধতি সফল করার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে? আমাদের শিক্ষকরা এ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আসেনি। এই পদ্ধতি আত্মস্থ করে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে তিন দিনের প্রশিক্ষণ কতটা সহায়ক তা বিবেচনার দাবি রাখে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা মনে করতে পারেন আমরা পারি তাহলে শিক্ষকরা পারবেন না কেন? শ্রেণীকক্ষের সাথে দফতরের আকাশ-পাতাল পার্থক্য তা কেউ হিসেবে নিতে চায় না। সে কারণে তিন দিনের প্রশিক্ষণকে যথেষ্ট মনে করে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। যদিও এখনো সব শিক্ষক এই তিনদিনের প্রশিক্ষণ পাননি। শিক্ষকদের যতই অযোগ্য মনে করা হোক না কেন তারা শ্রেণীকক্ষে অসম্মানিত হতে চান না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীকক্ষ দিন দিন গুরুত্ব হারাচ্ছে।

সৃজনশীল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য গাইড বই আর কোচিং নির্ভরতা কমানো। আজকের পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারি এ নীতি লোক দেখানো বিষয় বলেই মনে হয়। মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তাতে কোন আন্তরিকতার লেশমাত্র দেখা যায় না। বাজারে গাইড বই আর পাড়ার অলিগলিতে কোচিং সেন্টার দেখে এমনটাই অনুমান হয়। দেশের প্রতিটা সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন চায়। তাই সবাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের নামে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলে। এতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গিনিপিগে পরিণত হয়েছে। সারাবিশ্বে গিনিপিগের ওপর এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। শিক্ষা জীবনব্যাপী তাই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের নিরন্তন প্রক্রিয়া থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। আমরা রাতে স্বপ্ন দেখি আর সকালে ওঠে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে দেই। প্রস্তুতিহীন বাস্তবায়নের ফল যা হয় তাই হচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতির।

শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল বিষয় শিক্ষক দেবেন এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটাই গৌণ। পুরো ব্যবস্থায় গৌণ বিষয়গুলো মুখ্য হয়ে মূল বিষয়কে গৌণ করে তোলা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর প্রক্রিয়ায় কোনরকম গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকদের এই পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়ার সময় দেয়া হলো না। নামমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হলো। লাগাতার প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের যোগ্য করার কোন প্রক্রিয়াই গ্রহণ করা হলো না। অথচ দেখা যাবে সৃজনশীল পদ্ধতি দেশে চালু করতে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই টাকায় প্রশাসন ও শিক্ষা কর্মকর্তার কতবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য। কত টাকা ব্যয় হয়েছে এ অভিজ্ঞতা অর্জনে। খোঁজ করে দেখা যাবে যারা বিদেশে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন তাদের এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শিক্ষা ব্যবস্থা মধ্যে। এরা এখন অন্য কোন বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিজেদের শ্রমকে নিবেদিত করেছেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের অনেকেই বলছেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতির সমস্যা কেটে যাবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ শুনছে পাঠ্যবই পরিমার্জন করতে, সুখ পাঠ্য করতে হবে, সহজবোধ্য করতে হবে, আকর্ষণীয় করতে হবে। পদ্ধতি চালু করার পর ৮ বছর পার হয়ে গিয়েছে এখনো এসব কাজই বাকি আছে। এসব প্রস্তুতি ছাড়া সৃজনশীল পদ্ধতিকে গাইড বই আর কোচিং সেন্টারের কাছে সরকার দায়িত্ব দিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক করতে সরকারের আরো সময় লাগবে। এতে সাধারণ মানুষের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু গাইড বই? কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব প্রদান কোনভাবে মানা যায় না। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা এখন জিম্মি হয়ে পড়েছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি পুরোপুরি চালু করে তার সুফল পেতে আরো কয়েক বছর সময় লাগবে। ফলে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা গ্যাপ থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এ গ্যাপ নিয়েই নিজেদের জীবন গড়ছে। জাতি একটা অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ৮ বছর পার করে দিয়েছে এবং আরো কয়েক বছর পার করবে। এমন গোঁজামিলের মধ্যে জাতিকে শতভাগ পাসের প্রতিযোগিতার মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা যা সৃজন করুক না কেন শতভাগ অর্জন হিসেবে শতভাগ পাস প্রচলনের ফলে জাতির ভবিষ্যতে যে গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা পূরণ হবে কিভাবে? শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা অংশের গোঁজামিল পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের বিবেচনায় দুর্বল প্রাথমিক শিক্ষার কারণে যে সমস্যা আছে তার সাথে এ দুর্বলতা যোগ হওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে পড়ছে। পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন কিছু নতুন প্রয়োগ করতে গেলে এমনটাই হবে।

দেশের চাকরির বাজার মেধার চাইতে তদবিরের জোর বেশি। চাকরির বাজারে মেধা দিনে দিনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। মেধার জোরে চাকরি হওয়ার কথা শোনা ভাগ্যের ব্যাপার। সব জায়গায় আলোচনা শোনা যায় কত টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়া গিয়েছে। অথবা কোন মামার জোরে চাকরি জুটেছে। চাকরিতে যখন মেধার প্রয়োজন হয় না তখন শিক্ষার মান নিয়ে চিন্তা করার দরকার কি? বরং শতভাগ পাসের গর্বে আপ্লুত হতে পারলে মন্দ কি? সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা এখন সে পথেই ছুটে চলেছি। ধনী, প্রভাবশালী এবং ক্ষমতার বলয়ের মানুষের জন্য বিদেশ আছে বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে সেখানে সাধারণ মানুষের শিক্ষা নিয়ে গিনিপিগ বানাতে দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাই এখানে প্রস্তুতি নিয়ে বা শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার কোন প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না, করার দরকারও কেউ মনে করে না। এভাবেই আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল পদ্ধতি চলছে।

দেশে সব সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু করতে নিজেদের উৎসর্গ করার ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কিছু দিতে পারাটা আমাদের সরকারগুলোর সব সময়ের স্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলো স্বপ্নের মতো বাস্তবায়ন করা হতে থাকে। এনরোলমেন্ট বেড়েছে, ঝরে পড়া কমেছে, পাবলিক পরীক্ষার পাসের হার ও সিজিপি বেড়েছে। কিন্তু জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রায়োগিক এবং উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের অনেকটাই শিক্ষার্থীদের কাছে অধরা থেকে যাচ্ছে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পদ্ধতিতে দক্ষ হওয়ার জন্য যে সময় ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তার প্রচণ্ড অভাব রয়ে গিয়েছে স্বপ্নের মতো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে। সরকারগুলো পরিবর্তন চায় কিন্তু তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে চায় না। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা খাতে ব্যয় এখনো পর্যন্ত জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশের ওপরে যেতে পারেনি। দেশের মানুষ শুধু নয়, ২০০৬ সালের ডকোর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা খাতে সংশ্লিষ্ট দেশ জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ করবে। অর্থাভাবে বোধকরি আমাদের পরিকল্পনাগুলো কাগুজে পরিকল্পনা থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত বরাদ্দ বৃদ্ধি করা না হলে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুফল পাওয়া খুবই কঠিন।